শিক্ষা অমূল্য ধন কা'রা নেয় কেড়ে

ওবায়েদ উল হক

যুগপৎ স্তম্ভিত, বিস্ময়াভিভূত, বেদনাহত, শোকার্ত হবার মতো অবিশ্বাস্য, বিস্ময়কর, হৃদয়বিদারক, শোকাবহ সংবাদ। গত বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় সাড়ে তের শত বিদ্যালয়ের একজন পরীক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি। অর্থাৎ এক হাজার তিন শত পঞ্চাশটি স্কুলের সকল পরীক্ষার্থীই দলবদ্ধভাবে ফেল করেছে। ট্রুথ ইজ স্ট্রেইনঞ্জার দ্যান ফিকশন-এর এমন দৃষ্টান্ত আর হয় না। এবং এটাই বোধহয় কোন পাবলিক পরীক্ষায় এ যাবৎ গণঅকৃতকার্যতার বিশ্ব রেকর্ড।

পরের খবর-চার শত স্কুলে পাসের হার দশ শতাংশেরও কম। অর্থাৎ নব্বই জনেরও অধিক ফেল। এবং অন্য খবর-গত বছর এসএসসি পরীক্ষায় সারা দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল মাত্র ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ ৬০ শতাংশই ফেল। মানে কত অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী ফেল করতে পারে তারই পরীক্ষা এবং তেমন অকৃতকার্যতার বার্ষিক মহোৎসব। এমন উৎসব কাছে বা দূরের কোন দেশে হয় কিনা সন্দেহ। অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। গত ১১ মে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে খোদ শিক্ষামন্ত্রী এই বুক কাঁপানো তথ্য প্রকাশ করেছেন। মহান সংসদে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে করা ও দেয়া প্রশ্নোত্তরে এই তথ্য যথারীতি সরবরাহ করা হয়েছে। সুতরাং এর সত্যতা নিশ্চিতই প্রশ্নাতীত।

তবু প্রশ্ন থাকে এবং তা' হচ্ছে প্রথমত এমন একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দীর্ঘ এক বছর যাবৎ অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত ছিল কি কারণে? কোন সংসদ সদস্য এই প্রশ্নটি না করলে জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট এই গুরুতর তথ্যটি হয়ত অজানাই থেকে যেত এবং তাতে জাতির কোন মঙ্গল সাধিত হত? পরম আশ্চর্যের বিষয়, এই ভয়ানক তথ্যটি প্রকাশিত হবার পর সংসদে তেমন কোন উদ্বেগ-উদ্বিগ্নতা পরিলক্ষিত হয়নি। এমন সর্বনাশা ফল বিপর্যয় নিয়ে বিস্তারিত কোন আলোচনা সমালোচনা হয়নি। সব কিছুই যেন স্বাভাবিক, ঠিকঠাক আছে এমনি মনোভাব। যে সব স্কুল থেকে কোন পরীক্ষার্থীই এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি সেই সাড়ে তের শত স্কুলকে তাদের এমপিওভুক্তি কেন বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে এই সংবাদ ছাড়া আর কোন কথাবার্তাই সংসদে হয়েছে বলে সংবাদপত্রে দেখা যায়নি। এমন ভীতি— তথ্য জেনেও নিরুদ্বেগ থাকা কিসের লক্ষণ? বিরোধীদলীয় সদস্যদের অনুপস্থিতিতে সংসদ কি এতই প্রাণহীন হতে পারে? সকল জাতীয় কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র সংসদ এমনি নিষ্প্রাণ তা বিশ্বাস করা কঠিন। অথচ এত বিপুল সংখ্যক স্কুল থেকে একজন পরীক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি, এমন প্রাণঘাতী তথ্য প্রকাশের পরও সংসদে আলোচনার সামান্য ঝড়ও বয়নি অবিশ্বাস্য হলেও তা' অস্বীকার করার উপায় কি?

গত বছর দেশের সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় পাস অপেক্ষা ফেলের হারই ছিল অধিক। শতকরা ষাট জন পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। এই বিরাট ট্র্যাজেডীকে কমেডীর আদল দেয়ার নিষ্ঠুর প্রচেষ্টাও করা হয়। সরকারী সূত্রে বলা হয় নকল প্রতিরোধে কড়াকড়ি করায় পাসের হার কম হয়েছে। কি নির্মম কৌতুক! যেন নকল বন্ধ করতে পারা বা কমাতে পারাই কর্তৃপক্ষের এক অতুলনীয় সাফল্য এবং একমাত্র করণীয়। সেই বহু পুরনো কথাটাই মনে করিয়ে দেয়- অপারেশন সাকসেসফুল, বাট দি পেশেন্ট ডায়েড। রোগী মরে মরুক, অপারেশন ঠিক হলেই হল। নকল করে পাস করতে দেয়া হয়নি, এটাই তো কৃতিত্বের কথা। নকল না করে পাস করা যায় কিভাবে তা' নিয়ে মাথা ঘামাবার দায় তাদের নয়। প্রতিবছর এসব পরীক্ষায় ফেল করে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর জীবন অর্থহীন হয়ে যায়। কেউ কেউ আত্মহত্যাও করে বসে। আর মা-বাবা, অভিভাবকদের মানসিকভাবে ও আর্থিকভাবে দণ্ডিত করা হয়।

এমন বার্ষিক শোকের পাঁচালি গাইবার জন্যই কি পরীক্ষা নামক এমন বিপুল রাজকীয় আয়োজন করা হয়ে থাকে? একটি দু'টি নয়, দশ-বিশটি নয়, সাড়ে তের শত বিদ্যালয়ের (?) একজন পরীক্ষার্থীও হাসিমুখে পাসের খবর দিতে পারেনি এই নজিরবিহীন গণফেলের অবিশ্বাস্য তথ্য প্রকাশের পরও কারো মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েনি, কেউ শোকাহত হয়নি, লজ্জায় অধোবদন হয়নি? কিংবা অধীর কণ্ঠের ক্রুদ্ধ উচ্চারণ শোনা যায়নি কেন? কেন? কেন? আমরা কি প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকার সকল অর্থেই বেঁচে আছি বলা যায়?

বছর বছর পরীক্ষা নামক এরূপ অনিবার্য ট্র্যাজেডীর কারণ নির্ণয়ের কোন কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিনা জানি না। নেয়া হয়ে থাকলে তার ফলাফল জানি না। এ দেশে ঘটা করে নানা বিষয়ে কমিশন গঠিত হয়, নানা সাইজের নানা ধরনের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তাদের সব রিপোর্ট কি প্রকাশ করা হয়ে থাকে? সরকারী তথ্য গোপন রাখার লিখিত আইন আছে। অলিখিত নিয়মও আছে। বেসরকারী তথ্যও না চাইলে জানা যায় না। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জনগণ জানতে পারে? যে কোন গণতান্ত্রিক দেশে জানা অধিকার ও জানানো দায়িত্ব। এ দেশে এটা কেতাবি কথা। বাস্তবতা কি? সাড়ে তের শত স্কুলের যে সব পরীক্ষার্থী গত এসএসসি পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি তাদের মোট সংখ্যা কত তা' কোথাও বলা হয়নি। এ ব্যাপারে এই স্কুলগুলোর পূর্বেকার রেকর্ড কি তাও জানা নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগুলোর মান ও উপযুক্ততা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কতটা অবহিত তাও জানা নেই। চরম ফল বিপর্যয়ের পর তাদের এমপিওভুক্তি কেন বাতিল করা হবে না সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোকে তার কারণ দর্শাতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আসলে এই স্কুলগুলোর এমপিওভুক্তি কিভাবে সম্ভব হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তার কারণ অনুসন্ধান করে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করতে হবে। প্রিটেস্ট পরীক্ষা ও টেস্ট পরীক্ষার পর ফাইনাল পরীক্ষায় এমন দলবদ্ধভাবে ফেল করা হল কেন তা' নির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি? এসব স্কুলে শিক্ষার কার্যক্রম পরিদর্শনের দায়িত্ব যে সব সরকারী কর্মকর্তার তাঁদের বক্তব্য কি? এ ব্যাপারে জনগণের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিবৃত্তির লক্ষ্যে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে? এমন কোন পদক্ষেপ আদৌ নেয়া হয়েছে কিনা কে জানে।

একটি মহাজন উক্তি : শিক্ষা অমূল্য ধন নেয়া যায় না কেড়ে/যতই করিবে দান তত যায় বেড়ে। এর আদি অর্থ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এখনকার অর্থ হচ্ছে- শিক্ষাদান একটি খুবই অর্থকরী পেশা। শিক্ষাদান করে এখন প্রচুর অর্থাগম হয়। ফলে শিক্ষা লাভ আজকাল একটি অতিশয় ব্যয়বহুল ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ভালো বেতন দিয়ে স্কুলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তারা মোটা বেতন দিয়ে কোচিং সেন্টারেও পড়ে। এর উপর বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রতিবছর সরকারী অর্থ অর্থাৎ করদাতাদের ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ হচ্ছে ১৭ শত কোটি টাকা। কিন্তু এত মূল্য দিয়েও অধিকাংশ শিক্ষার্থীই শিক্ষা নামক অমূল্য ধন লাভে ব্যর্থ হয়। পরীক্ষার কাউন্টার থেকে তারা ফেল করার গ্লানি নিয়ে খালি হাতে ফিরে আসে। এ বিষয়ে এই শিক্ষাদাতাদের কি কিছুই বলার ও করার নেই? প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকরাও তো শিক্ষক সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবছর এই বিয়োগান্ত নাটকাভিনয় সম্পর্কে তাঁরাও নির্বাক থাকবেন কেন? সদ্য সমাপ্ত এসএসসি পরীক্ষার ফল কেমন হবে ভেবে এখনি বুক কাঁপতে শুরু করেছে। প্রার্থনা করি আর পাইকারি ফেল করাবার আনন্দ নয়। এবার গড়ে পাস করাবার আনন্দ দেখতে চাই। শিক্ষা তো বিনা মূল্যে অকাতরে দান করার মতো দাতব্য ব্যাপারে নয়। অর্থের বিনিময়ে দেয়া শিক্ষা দান ও গ্রহণের ব্যাপারে দায়দায়িত্ব তো অবশ্যই থাকতে হবে।

কিছুকাল আগেও শিক্ষা ছিল জাতীয় বাজেটে উপেক্ষিত। ঔপনিবেশিক আমলে তো বটেই। তখন শাসকেরা জানতো "education makes a people easy to govern, but impossible to enslave". শিক্ষিতজনদের শাসন করা সহজ হতে পারে, কিন্তু ক্রীতদাসে পরিণত করা অসম্ভব। শিক্ষা ছাড়া কোন প্রকার উন্নতিই কিছুতেই সম্ভব নয়, বর্তমানে কাজে ততটা না হলেও কথায় এই পরম সত্যের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি উচ্চরবেই উচ্চারিত হয়। এখন জাতীয় বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি। এর বিশেষ তাৎপর্য স্বীকার করতেই হবে।

তথাপি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহেলিত থাকার ফলে শিক্ষার প্রতি বাজেটীয় সমাদর তেমন ফলপ্রসূ হচ্ছে না। সেই শিক্ষা হচ্ছে, দুর্নীতির কারণে উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবেই ব্যাহত ও ব্যর্থ হয়ে যায়। এই শিক্ষা না হলে, অর্থাৎ কার্যত না হলে সকল শিক্ষাই অসার। সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ বরবাদ। দুর্নীতিবাজদের পকেট যত ভারি হবে জাতির ঋণের বোঝা ততই বাড়তে থাকবে। দাতাগোষ্ঠী খোলাখুলি বলেছে, বাংলাদেশে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেক্টরে। অর্থাৎ দুর্নীতি জাতির দেহ ও মনকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলছে। যে শিক্ষা মানুষকে প্রকৃত অর্থে মানব সম্পদে উন্নীত করে সে শিক্ষার পরিবর্তে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের দুর্নীতিই শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদে দেখা গেল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও অসৎ প্রকাশকেরা মিলে শত শত স্কুলে সরবরাহ করার জন্য হাজার হাজার অপ্রয়োজনীয়, পাঠের অনুপযোগী ও নিম্নমানের বই কিনে কয়েক কোটি টাকা আত্মসাতের চক্রান্ত করেছে। রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্যেও লাখ লাখ টাকার বই কেনার অভিযোগ রয়েছে। এটা সমুদ্রে বিন্দুমাত্র। দেশ দুর্নীতির মহাসমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। শিক্ষা খাতও যদি তাতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে তবে বাঁচার ভরসা কি?

নজিরবিহীন গণফেলের অবিশ্বাস্য তথ্য প্রকাশের পরও কারো মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়েনি, কেউ শোকাহত হয়নি, লজ্জায় অধোবদন হয়নি? কিংবা অধীর কণ্ঠের ক্রুদ্ধ উচ্চারণ শোনা যায়নি কেন? কেন? কেন? আমরা কি প্রকৃতপক্ষে বেঁচে থাকার সকল অর্থেই বেঁচে আছি বলা যায়?

দৈনিক
তারিখ 20 MAY 2003
পৃষ্ঠা ...